ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত

ক্রুসেড, জায়োনিজম ও সেক্যুলারিজমের আদ্যপান্ত

জিয়াউল হক

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

◈ ধর্ম ও চিন্তার সংঘাত ১৭
◈ সংঘাতের মেরুকরণ ও ভৌগোলিক ঠিকানা ২৬
◈ গ্রিক সভ্যতার পতন ও রোমের উত্থান ৩২
◈ রোমানদের জেরুজালেম দখল ৩৮
◈ ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাব ও ইহুদি প্রতিক্রিয়া ৪৭
◈ খ্রিষ্টধর্মে ইহুদি নিয়ন্ত্রণ, খ্রিষ্টবাদের বিকৃতি ৫১

দ্বিতীয় অধ্যায়

◈ ইউরোপে খ্রিষ্টবাদের আগমন ৬৩
◈ চার্চের উদ্ভব ও তার সামাজিক ভিত্তি ৬৭
◈ বিকৃত বাইবেলের আত্মপ্রকাশ ৭৫
◈ খ্রিষ্টবাদের অভ্যন্তরীণ বিবাদের প্রকাশ্যরূপ ৮৪
◈ রাজনৈতিক খ্রিষ্টবাদের অভিষেক ৯১
◈ খ্রিষ্টবাদের দ্রুত বিস্তার ও বিভেদের বীজ ৯৭

তৃতীয় অধ্যায়

◈ ইউরোপীয় দর্শন হিসেবে খ্রিষ্টবাদের অভিষেক ১০৭
◈ ইউরোপের উদ্ভব ১১২
◈ ইউরোপ ও ইসলাম : পারস্পরিক পরিচিতি ১১৮
◈ ইউরোপ ও ইসলাম : পারস্পরিক সম্পর্ক ১২৪
◈ সংঘাতের শুরু : ক্রুসেড-পটভূমি ১২৭

চতুর্থ অধ্যায়

◈ ক্রুসেড ১৫১
◈ ক্রুসেডের ফলাফল-স্থায়ী শত্রুতা ১৬৭
◈ ক্রুসেডের ফল : সামাজিক বিপর্যয় ও জ্ঞানের মেরুকরণ ১৭৩
◈ ক্রুসেডের ফল - শোষণের ভিন্নমাত্রা ১৮১
◈ ধর্ম : নিপীড়নের হাতিয়ার ১৮৯
◈ ধর্মান্ধতার পাশবিক রূপ : ইনকুইজিশন ১৯৭

পঞ্চম অধ্যায়

◈ চিন্তার বিকাশ দমনে ধর্মের অপব্যবহার ২০৫
◈ ক্ষোভের বিস্ফোরণ ও প্রকাশ : গণপ্রতিরোধ ২১২
◈ সেক্যুলারিজম : নতুন ধর্মের আত্মপ্রকাশ ২২১
◈ নয়া পৃথিবীর নতুন ধর্ম ২৩৩
◈ ইউরোপ : ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ফেরিওয়ালা ২৪৩
◈ সমকালীন ইউরোপীয় মানসপট : বিজ্ঞানমনস্কতা ২৫২
◈ বিজ্ঞানের ব্যর্থতা : নাস্তিক্যবাদের স্বপ্নভঙ্গ ২৫৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

◈ ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদ : সংঘাতের ভিত্তি ২৭১
◈ হাওয়া বদল : শুরুটা যেভাবে ২৭৯
◈ শত্রু মিত্র একাকার : দৃশ্যপটে ইহুদিদের উত্থান ২৮৭
◈ মুসলিমমানসে চিন্তার নৈরাজ্য ২৯৭
◈ পতনের আলামত : বিতর্ক ও বিড়ম্বনা ৩০৪
◈ ঘরের শত্রু বিভীষণ ৩১১
◈ সাবাত্বাই জেভি ৩১৭

সপ্তম অধ্যায়

◈ ইয়ংতুর্ক : সাবাত্বাই জেভির মানসপুত্র ৩৩১
◈ নয়া বিশ্বব্যবস্থা ৩৩৭
◈ আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান ৩৪৫
◈ চূড়ান্ত আঘাত ৩৫৮
◈ আত্মঘাতী আরব ৩৭১

অষ্টম অধ্যায়

◈ খিলাফত বিলোপ ৩৮১
◈ কামাল পাশার মানসপট ও অবদান ৩৮৭
◈ সেক্যুলারিজমের প্রয়োগ বাস্তবতা ৩৯৬
◈ সম্রাট আকবরের মানবধর্ম : সেক্যুলারিজমের ভিন্নরূপ ৩৯৮
◈ সেক্যুলারিজমের জন্মভূমি ৪২১

নবম অধ্যায়

◈ আপনার বিবেচ্য ৪৪৭
◈ আত্মজিজ্ঞাসার পালা ৪৫৬

প্রথম অধ্যায়

ধর্ম ও চিন্তার সংঘাত

ধর্ম কী? মানুষের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের একগুচ্ছ বিধিমালাই ধর্ম। এই দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে ধর্মকে আমরা লাগামের সাথে তুলনা করতে পারি। একজন আরোহী ঘোড়ার মুখে লাগাম লাগিয়ে তার পিঠের ওপর চেপে বসে শুধু যে তাকে চালিত করে তা-ই নয়; তাকে নিয়ন্ত্রণও করে। তেমনই ধর্ম লাগামের মতোই মানুষকে প্রবৃত্তি বা নফসের প্ররোচনা এবং অন্যায়-অনাচার থেকে ফিরিয়ে রাখে। পাশাপাশি তাকে চালিত করে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে। ঘোড়ার মুখে লাগাম না থাকলে যেমন মালিকের পক্ষে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না, তেমনই ধর্মের অনুশাসন মানুষের মধ্যে জাগরূক না থাকলে মানুষের পক্ষেও তার ভেতরের কুপ্রবৃত্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় না।

জন্মের সাথে সাথে অস্তিত্বের অংশ হিসেবেই মানুষকে তার ধর্মের প্রাথমিক জ্ঞান তথা নীতি-নৈতিকতা, ভালো-মন্দের প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। আল কুরআনে এ দিকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে—'(সৃষ্টির পর) তাকে ভালো মন্দের জ্ঞান দিয়ে দেওয়া হয়েছে।'[১]

অন্যত্র বলা হয়েছে—'তাকে কি (অর্থাৎ সৃষ্টির পরে মানুষকে) ভালো-মন্দ দুটো পথই স্পষ্ট করে দেখাইনি?'[২]

যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, এটি অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই ভালো-মন্দের মৌলিক জ্ঞান পেয়ে থাকে। এটিই ধর্ম। অথচ যে সৃষ্টিকর্তা মানুষের মধ্যে এই মৌলিক জ্ঞানটুকু দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেন, মানুষ সেই সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর অনন্য বিধানকেই অস্বীকার করে বসে।

মানুষের এই প্রবণতা অর্থাৎ, পুরো বিশ্বজাহানের অস্তিত্বের পেছনে একজন সৃষ্টিকর্তা, রক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের ধারণাকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা প্রতিটি যুগেই ছিল। মানবেতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়; এমনকি একেবারে প্রাথমিক যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও আমরা দেখব, ধর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং অস্তিত্বকে অস্বীকার করা লোকের কখনোই অভাব ছিল না। এ যুগেও তার ব্যতিক্রম নেই। আজকাল ধর্মকে যেমন অস্বীকার করা হয়, তেমনই তার গুরুত্ব আর প্রভাবকে খাটো করার বিভিন্ন ছলচাতুরির আশ্রয় নিতেও দেখা যায়।

আধুনিক যুগে নাস্তিকতা একরকম ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান একটি গোষ্ঠী ধর্মকে একেবারে অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক ও অনুল্লেখযোগ্য একটি বিষয়ে পরিণত করার ব্যাপারে অতি উৎসাহী। ধর্মকে তারা দেখতে চায় সমাজ ও এর পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে মানুষের মিথস্ক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট ফলাফল হিসেবে।

---

[১] সূরা আশ শামস : ৮

[২] সূরা আল বালাদ : ১০

'Religion is the product of certain type of interaction between man and his environment.'[৩]

আধুনিক বিশ্বে প্রায় প্রতিটি সমাজেই চিন্তাবিদ ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে বিতর্ক চলমান। প্রাচীন যুগে এ ধরনের বিতর্কের ভাব ও ভাষা ছিল একরকম; আধুনিক যুগে বিতর্কের ভাব, ভাষা আর উপস্থাপনার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকলেও মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে পূর্বের সাথে এর তেমন কোনো পার্থক্য নেই। এসব তর্কের উদ্দেশ্য মূলত একটিই—সৃষ্টিকর্তা ও ধর্মকে অস্বীকার।

প্রকৃত বাস্তবতা হলো—হাজার হাজার বছর ধরে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি সমাজে একটি গোষ্ঠী কর্তৃক ধর্মের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ধর্ম টিকে গেছে। আর তা টিকে গেছে ধর্মের অভ্যন্তরীণ শক্তির জোরেই। ধর্ম প্রাচীনকালের একটি কুসংস্কারমাত্র—এমন ধারণা খণ্ডনের পাশাপাশি এর অভ্যন্তরীণ শক্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জনৈক সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন—

'This moral or Religious, whatever we choose to call it, is extraordianlly strong. When faced by opposition, and even by powerful political attempts at suppression, it obstinately refuses to lie down and die. One often comes on statement that Religion is a primitive superstition that modern man can do well without. Yet, if the impulse were truly primitive in a biological sense (as for instance patriotic loyalty to the group in which one happens to live is primitive) we would sure expect to see it in other animals. As far as I know, no one has advanced any evidence for this idea.'[৪]

এ রকম বাদানুবাদ ও পক্ষে-বিপক্ষে মতামত, যুক্তির উপস্থাপন সেই আদিকাল থেকেই মানবসমাজে চলে এসেছে। এ ধারা আজও চালু রয়েছে। আর আধুনিক বিশ্বে সেই ধারার অন্যতম এক মাত্রা হলো—সেক্যুলারিজম।

সমাজ ও সভ্যতার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তার প্রয়োজনও বেড়ে যায়, বিস্তৃত হয়, মানব রুচিতে পরিবর্তন আসে। সমাজের জ্ঞানী-গুণী সদস্যরা নানা প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিত্যনতুন চিন্তাভাবনা ও জ্ঞান-গবেষণা করেন। যুগের ব্যবধানে মানুষের চিন্তায়ও পরিপক্বতা আসে। সমাজের জ্ঞানী ও বিদগ্ধ শ্রেণির লোকজনই এ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়। তারাই সমাজে লেখক, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী ও গবেষক হিসেবে পরিচিত। তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানের কারণেই একটি সমাজ এগিয়ে যায় সমৃদ্ধি ও পরিপক্বতার দিকে। সমাজের অধিকাংশ লোকের চিন্তা ও ধ্যানধারণার তুলনায় তারা সাধারণত এগিয়ে থাকেন। এই এগিয়ে থাকাটাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের জন্য বিপদের কারণ হয়। সমাজের সদস্যদের মধ্যে পক্ষ-বিপক্ষ বিভাজনের এটিও অন্যতম একটি কারণ। সংঘাতের সৃষ্টিও হয় এ থেকেই। ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে এ রকম ঘটনার নমুনা অসংখ্য।

---

[৩] *Man in the Modern World*, Julian Huxley, পৃষ্ঠা : ১৩০

[৪] *The Inteligent Universe,* Fred Hoyle, পৃষ্ঠা : ২৩৩

ধর্মের সাথে বিজ্ঞান ও মুক্তচিন্তার সংঘাতের ইতিহাস অনেক পুরোনো। আমরা অনেকেই মনে করি, ধর্ম-বিজ্ঞান সংঘাতের সূত্রপাত বোধহয় খ্রিষ্টবাদের সাথে অর্থাৎ মধ্যযুগের শেষভাগে এসে খ্রিষ্টান পাদরিদের সাথে বিজ্ঞানীদের সংঘাতের ঘটনা থেকে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। ধর্মের সাথে বিজ্ঞানী, গবেষক ও সমাজ সংস্কারকের এ জাতীয় সংঘাতের উৎপত্তি খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে গ্রিক সমাজে।

প্রাচীন গ্রিকদের ধর্মবিশ্বাস ছিল বিচিত্র ধরনের। বহু ঈশ্বরভিত্তিক ধারণায় বিশ্বাস করত তারা। গ্রিকদের ধারণা অনুযায়ী, সেই ঈশ্বরদের বসবাস ছিল গ্রিস মেসিডোনিয়া সীমান্তব্যাপী মাউন্ট অলিম্পাস নামে পরিচিত ইউরোপের সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গে।[৫] এই পর্বতশৃঙ্গ প্রায় ৫২টি উঁচু চূড়াবিশিষ্ট; যার অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৯১৮ মিটার উঁচুতে।

পৌরাণিক কল্পকাহিনিতে ভরপুর গ্রিক সমাজ বিশ্বাস করত, ভূদেবী (Gaia) হলো আকাশ (Uranus)-এর মা। কোনো পুরুষের সংস্পর্শ ছাড়াই ভূদেবী আকাশ বা ইউরেনাসকে জন্ম দিয়েছে। এর পরে তাদের উভয়ের সম্মিলনে একে একে জন্ম নিয়েছে সিওস, ক্রিয়াস, ক্রোনাস, হিপোরোন, ইপিটাস ও ওশেনাস নামে ছয়জন পুত্র আর নিমোসিন, রিয়া, সিয়া, থেমিস ও তেথিস নামে ছয়জন কন্যা সন্তান। ভূতল (Gaia) ও আকাশের (Uranus) এই ১২জন সন্তান-সন্ততিকে একত্রে বলা হতো টাইটানস (Titans)। তারা সকলেই গ্রিক দেব-দেবীর মর্যাদা পেয়েছে।[৬]

গ্রিক মিথোলজি অনুযায়ী, দেবতা জিউস আকাশে বসে তার রাজত্ব পরিচালনা করেন। আর তাকে ঘিরে নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্র-পরিজনসহ বসে থাকে অন্যান্য দেবতাগণ। এই দেবতারা হলেন ঈশ্বর জিউসের সভাসদ। তারা সম্মিলিতভাবে শলাপরামর্শ করে বিশ্ব পরিচালনা করে।

সেকালে অবিশ্বাস্য বীরত্ব ও মাহাত্ম্য প্রদর্শনকারী যেকোনো মানবসন্তানকেই গ্রিকবাসীরা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী বিভিন্ন দেব-দেবীর সাথে জুড়ে দিত। ভাবত, সে অমুক দেব-দেবীর সন্তান। এ ধরনের অতিমানবীয় যোগসূত্র গ্রিক সমাজের রাজা-মহারাজদের সমাজে প্রশ্নাতীত আনুগত্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী করে তুলত। ঠিক এমনটাই ঘটেছে আমাদের কাছে মহাবীর বলে পরিচিত আলেকজান্ডারের বেলাতেও।

বাবা ফিলিপ আচমকা এক আততায়ীর হাতে নিহত হলে মাত্র ২২ বছরের যুবক আলেকাজান্ডার রাজ্যশাসনের দায়িত্ব নেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩৬ সালে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বর্তমান গ্রিসের মেসিডোনিয়ায় যুবরাজ আলেক্সজান্ডার, ইতিহাসে যাকে আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট বলে অভিহিত করা হয়, ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তার পরপরই বিশ্বজয় করতে বেরিয়ে পড়েন। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩৪ সালের গ্রীষ্মের শুরুতেই আলেকজান্ডার ৩৪ হাজার পদাতিক ও চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে দক্ষিণের ‘Issus’ অর্থাৎ বর্তমান সিরিয়া দখল করে নেন।

---

[৫] peaklist.org. 31 December 2010

[৬] *History of the Conflict between Religion and Science*. John William Draper পৃষ্ঠা : ১ Produced by Charles Keller, Last updated: March 27, 2012. Project Gutenberg EBook [EBook #1185]

এর পরপরই তিনি এশিয়া মাইনরে অর্থাৎ তুরস্কের 'Iskenderun' শহরে পারস্য রাজা সম্রাট তৃতীয় দারিউসের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে পারস্য বাহিনীকে পরাজিত করেন। এরপরে নেমে পড়েন অগণিত সামরিক অভিযানে, বিশ্বজয়ের লক্ষ্যে। শুরু হয় রক্তক্ষয়, প্রাণ ও সম্পদহানি, ধ্বংস ও তাণ্ডবের নতুন এক অধ্যায়। এর সবই ছিল তাৎক্ষণিক ফল। কিন্তু তার এসব অভিযানই গ্রিক সমাজের ভেতর থেকে ধ্বংস ডেকে আনে। গ্রিক সমাজ এ রকমই একটি পটভূমিতে এসে উপস্থিত হয় যে, এর বিশ্বাস আর দর্শনের সাথে বুদ্ধি ও চিন্তা তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বসংঘাতের একটি ক্ষেত্র তৈরি হয়। আমরা অতি সংক্ষেপে সেদিকে একটু আলোকপাত করব।

পারস্য সম্রাট দারিউস নিজ সীমান্তে গ্রিক বাহিনীর আক্রমণ ও তার সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করার খবর শুনে ত্বরিত পদক্ষেপ নেন। গ্রিক বাহিনী যেন সিরিয়া দখল করতে না পারে, সেজন্য তিনি নিজে লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যান। কিন্তু এত বিশাল ৬ নিয়েও সম্রাট দারিউস আলেকজান্ডারের সামনে টিকতে তো পারলেনই না; বরং প্রায় ১ লক্ষ সৈন্য হারালেন যুদ্ধক্ষেত্রেই। তার স্ত্রীসহ সন্তান-সন্ততিকে বন্দি করা হলো। সেইসাথে হাতছাড়া হয়ে গেল পারস্য সাম্রাজ্যের বিশাল ও অভাবনীয় পরিমাণ সম্পদ, স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, মণি-মুক্তা ও দুর্মূল্য রত্নভান্ডার এবং পারস্যের স্বর্ণভান্ডার বলে খ্যাত সিরিয়া।[৭]

এরপর আলেকজান্ডার জেরুজালেম ও গাজা দখল করেন। জেরুজালেম প্রায় বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করলেও মিশরের দিকে যাওয়ার পথে গাজাসহ অন্যান্য ছোটোখাটো শহরগুলো পারস্য সম্রাটের গভর্নর বেটিসের নেতৃত্বে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু দীর্ঘদিন পারস্যের নাগপাশে নিষ্পেষিত থেকে একরাশ অসন্তোষ নিয়ে বহিঃশত্রু আলেকজান্ডারকে মিশরীয়রা দুবাহু বাড়িয়ে সাদরে আলিঙ্গন করে নেয়। আর এভাবে মিশর খুব সহজেই গ্রিক হেলেনিক শাসনের আওতায় চলে আসে।

আলেকজান্ডারের এই বিজয়গুলো সামরিক দিকে থেকে যতটা তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, তার চেয়ে লক্ষ-কোটি গুণ বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল সামাজিক ও আদর্শিক দিক বিচারে। বিশ্ব ইতিহাসে এ সামরিক অভিযানগুলোর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে, এই ঘটনা কেবল ওই অঞ্চলকেই নয়; বরং পুরো বিশ্বে মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ ইতিহাসকেই বদলে দিয়েছে।

এটি ছিল ইতিহাসের এক বিরাট টার্নিং পয়েন্ট। এ অভিযানের ফলে যে গণবাস্তুচ্যুতি (Mass Migration) ঘটে, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তার প্রভাব পড়েছে সীমাহীন ও অকল্পনীয়। এ অভিযানের ফলেই ইউরোপের প্যাগান ধর্মাবলম্বী গ্রিকরা প্রথমবারের মতো একেশ্বরবাদী দর্শনের সাথে পরিচিত হয়। আবার একই সাথে প্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের সমাজও গ্রিক ধাঁচের প্যাগানিজমের সাক্ষাৎ পেয়ে তার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। বিশেষ করে জেরুজালেম, প্যালেস্টাইন, মিশর, পারস্য ও ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশ সরাসরি গ্রিক দর্শন ও সংস্কৃতির ছোঁয়া পায়। এর ফলে এসব অঞ্চলের জনমানস, তাদের জীবনযাত্রার ধরন, বোধ-বিশ্বাস, আদর্শ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর এর এক বিরাট প্রভাব পড়ে।

---

[৭] *History of the Conflict between Religion and Science.* John William Draper পৃষ্ঠা : ১, Produced by Charles Keller, Last updated: March 27, 2012. Project Gutenberg EBook [EBook #1185]

প্রখ্যাত ইংরেজ গবেষক ও লেখিকা কারেন আর্মস্ট্রং বিষয়টি তার এক লেখায় খুব সংক্ষেপে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি লেখেন—

> 'In 332 BCE Alexander of Macedonia defeated Darius III of Persia and the Greeks began to colonise Asia and Africa. They founded city-states in Tyre, Sidon, Gaza, Philadelphia (Amman), Tripolis and even in Schechem. The Jews of Palestine and the diaspora were surrounded by an Hellenic culture which some found disturbing but others were excited by Greek theatre, philosophy, sport and poetry. They learned Greek, exercised at gymnasium and took Greek names. Some fought as marcineries in the Greek armies. They even translated their own scriptures into Greek, producing the version known as the Septuagint. Thus some Greeks came to know God of Israel and decide to worship Yahweh (or Iao, as they called him) alongside Zeus and Dionysius. Some were atratcted to the Synagogues meeting houses, which the diaspora Jews had evolved in place of the temple worship. There they read their scriptures, prayed and listened to sermons. The synagouge was unlike anything else in the rest of the ancient Religious world. Since there was no rituals and sacrifice, it must have seemed more like a school of philosophy and many flocked to the synagogue if a well known Jewish preacher came to town, as they would queue up to hear their own philosophers.'[৮]

এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে কিছু গ্রিক দর্শন ও বোধ-বিশ্বাস এবং তার আচার-আচরণ তাওরাত দ্বারা প্রভাবিত হবে সেটা বলাই বাহুল্য। সে সত্যেরও ইঙ্গিত আমরা পাই ওই একই লেখিকার লেখা থেকে। তিনি আরও লিখেছেন—

> 'Some Greek even observed selected parts of the Torah and joined Jews in syncretist sects. During the fourth century BCE, there were isolated instances of Jews and Greeks marging Yahweh with one of the Greek Gods.'[৯]

এ তো গেল পশ্চিম এশিয়া তথা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বা প্যালেস্টাইন ও জেরুজালেমের কথা। এসব অঞ্চলে ইহুদি ধর্মপ্রভাবিত এলাকায় সম্রাট আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে পরিচালিত গ্রিকদের সামরিক অভিযানসমূহের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও ফলাফল ছিল অপরিসীম। এর বাইরে ওই

---

[৮] Karen Armstrong, *A History of God*, Vintage Books, London, পৃষ্ঠা : ৮২

[৯] Karen Armstrong, *A History of God*, Vintage Books, London, পৃষ্ঠা : ৮২-৮৩

একই রকম প্রভাব ও ফলাফল আমরা দেখতে পাই তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম সুপার পাওয়ার পারস্য সাম্রাজ্যের ওপরেও।

সম্রাট আলেকজান্ডারের বিজয়ের সাথে সাথে তৎকালীন বিশ্বশক্তি পারস্য সাম্রাজ্যেও এক বিরাট ধাক্কা লাগে। এই বিজয়ের মাধ্যমে গ্রিক সামরিক বাহিনী দক্ষিণে মিশর, পূর্বে আসিরীয় ও পারস্য সাম্রাজ্য এবং আরও পূর্বের দিকে এসে ভারতীয় উপমহাদেশের দিকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগোতে থাকে। সামরিক বাহিনীকে ঝড়ের গতিতে ধাবিত করে আলেকজান্ডার এক এক করে প্রায় বিনা বাধায় দক্ষিণ দিকে বর্তমান ফিলিস্তিনের টায়ার, আশকেলোন, একো ও গাজা দখল করে নেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩৩ সালে বর্তমান সিরিয়াও তার করায়ত্ত হয়।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২ সালে তৎকালীন মিশরের জেলেপল্লি দখল করে নিজের নামে সেখানে একটি শহরের গোড়াপত্তন করেন। কালক্রমে সেটি বিশ্ববিখ্যাত শহর ও নৌ-বন্দর হিসেবে গড়ে ওঠে। সেই শহরটিই আধুনিক মিশরের 'আলেকজান্দ্রিয়া'। এরপরে তিনি পূর্বদিকে ভারত অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। পথে তিনি ব্যাবিলন বা বর্তমান বাগদাদ, তাইগ্রিস নদীর উপকূলীয় অঞ্চলকে গ্রিক শাসনের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করেন। ৩২৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তিনি বাগদাদেই মৃত্যুবরণ করেন।

এভাবেই বিশ্ব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সুলাইমান ও দাউদ (আ.)-এর ফিলিস্তিন, মুসা ও ইয়াকুব (আ.)-এর মিশর এবং ইবরাহিম, ইসহাক ও ইসমাইল (আ.)-এর স্মৃতিবিজড়িত মেসোপটেমিয়া বা ইরাকসহ বিশাল এলাকা হেলেনিক তথা গ্রিক প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বলয়ের ভেতরে চলে আসে। সম্মানিত নবিদের পদস্পর্শে ধন্য এইসব অঞ্চল এবং সেখানে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মন-মানস ও চিন্তাচেতনা গ্রিক দর্শন, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং রসম-রেওয়াজের সাথে পরিচিত হয়।

আমাদের এ কথাটা মনে রাখা দরকার, গ্রিকরা এসব অঞ্চলে রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আর এ কথা অতি সহজেই বোধগম্য, রাষ্ট্রক্ষমতায় যে আদর্শের শক্তি অধিষ্ঠিত থাকে, সেই আদর্শ ও কৃষ্টি কালচার দ্বারা জনগণও সহজেই প্রভাবিত হয়। তাই নির্দ্বিধায় বলা চলে, রাজনৈতিক এই পরিবর্তন যে কেবল গ্রিক সভ্যতাকেই প্রভাবিত করেনি; বরং গ্রিক সভ্যতার উত্তরসূরি রোমান সভ্যতাকেও প্রভাবিত করেছে। পাশাপাশি ঐশী বিধান দ্বারা শাসিত ও পরিপুষ্ট অঞ্চলসমূহ তথা মিশর, বাগদাদ ও ফিলিস্তিন—এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের অধিবাসী, তাদের বোধ-বিশ্বাস, সমাজব্যবস্থা ও জীবনাচারকে তিলে তিলে বদলে দিয়েছে চিরতরে।

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পরে লিবীয় মরুভূমির প্রায় দুই শত মাইল ভেতরে অবস্থিত দেবতা 'জুপিটর আমোন'-এর এক প্রাচীন মন্দিরে সম্রাট আলেকজান্ডার তার দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদনে যান।[১০] প্রচলিত বিশ্বাসানুযায়ী এই জুপিটার আমোন ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র এবং আকাশ, তারকারাজি ও মেঘমালার নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

গ্রিক সমাজে ঈশ্বরের সন্তান হওয়াটাকে দেখা হতো গৌরব, সম্মান আর ক্ষমতার আধার হিসেবে। সম্রাট আলেকজান্ডার কর্তৃক 'জুপিটার আমোন'-এর মন্দিরে গমন ও সেখানে তার উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদনের পরে চারিদিকে প্রচারিত হয়ে যায়—আলেকজান্ডারই হলেন ঈশ্বরের পুত্র। লোকমুখে রটে

---

[১০] *History of the Conflict between Religion and Science*. John William Draper পৃষ্ঠা : ১ Produced by Charles Keller, Last updated: March 27, 2012. Project Gutenberg EBook [EBook #1185]

যায় (আলেকজান্ডারের সভাসদদের কারও দ্বারাই এমনটা রটিয়ে দেওয়া হয়), আলেকজান্ডারের মা অলিম্পিয়ার সাথে ঈশ্বর জুপিটার আমোনের মিলনের ফলেই জন্ম নিয়েছেন আলেকজান্ডার। আর বিষয়টি স্বয়ং দেবতা জুপিটারই আলেকজান্ডারকে জানিয়েছেন।

কোনো মানুষকে ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা গেলে ওই সদস্যের প্রতি আপামর জনসাধারণের অকৃত্রিম ও নিঃশর্ত আনুগত্য নিশ্চিত করা যায়। আলেকজান্ডারকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য মোটামুটি একই রকম। এটি যে মানুষের ধর্মীয় আবেগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে একটি চাল এবং সম্রাট হিসেবে স্থানীয় জনগণের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নাতীত করে নেওয়ার লক্ষ্যেই রচিত ও প্রচারিত, তা সহজেই অনুমেয়।

এ ব্যাপারে স্বয়ং আলেকজান্ডারের কতটা সায় ছিল, ইতিহাসের কোনো সূত্র থেকে তা যাচাই করার কোনো উপযুক্ত মাধ্যম ও তথ্য-প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে মিশর জয়ের পরে সেখানে স্বল্পসময় অবস্থানকালে সম্রাট আলেকজান্ডার যে রাজকীয় ফরমানগুলো জারি করেন, সেখানে নিজেকে তিনি ঈশ্বরের পুত্র হিসেবেই অভিহিত করেছেন। এতটুকু প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। এর ফলে বিশ্বাস করার সংগত কারণ রয়েছে যে, খোদ আলেকজান্ডারের মনেও এ ধারণা রটিয়ে দেওয়ার প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল।

আলেকজান্ডারের মা অলিম্পিয়া তার সাথে দেবতা জুপিটারকে জড়িয়ে পুত্রের প্রচারণায় অসন্তুষ্ট ছিলেন। অবশ্য আলেকজান্ডারের সভাসদ ঐতিহাসিক এডওয়ান সম্রাটের এ ধরনের কাজের বিরোধিতা না করে এটিকে বরং মিশরের জনগণকে বিভ্রান্ত করার একটি রাজনৈতিক চাল হিসেবে চালিয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

> 'I cannot condemn him for endeavoring to draw his subjects into the belief of his divine orDgin, nor can I be induced to think it any great crime, for it is very reasonable to imagine that he intended no more by it than merely to procure the greater authority among his soldiers.'[১১]

তবে মিশরীয় সমাজের আদি অধিবাসীগণ ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে আলেকজান্ডারকে কতটা আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছিল, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

[১১] *History of the Conflict between Religion and Science*. John William Draper, পৃষ্ঠা : ১